সাপুড়ে

কাহিনী

সভ্যজগতের সুসমৃদ্ধ জনপদ হইতে বহুদূরে, কখনও ঘননীল শৈলমালার সানুদেশে, ভীষণ নির্জন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে, কখনও বা তরঙ্গ-ফেনিল বঙ্কিম গিরিনদীর তীরে, দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, যাযাবর সাপুড়ের দল তাহাদের ক্ষণস্থায়ী নীড় রচনা করে।

এমনই এক ভবঘুরে সাপুড়েদলের ওস্তাদ সে। নাম তাহার জহর। দলের সে বিধাতা, একচ্ছত্র অধিপতি। দলের প্রত্যেকটি লোক তাহাকে ভয় করে যমের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটিমাত্র লোক, তাহার এই অপ্রতিহত প্রভুত্ব-গৌরবে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, মনে-মনে দারুণ অবজ্ঞা করে জহরকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাহার হয় না। এই লোকটির নাম বিশুন, তাহারও দুই একজন অনুচর আছে।

মনে-মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও-বা কেমন করিয়া জহরকে চূর্ণ করিয়া একদিন সে সর্দার হইয়া উঠিবে, সেই কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন নাগ-পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষধর সর্পের সন্ধানে। তাহার তুবড়ি বাঁশিতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া সুর—বাঁশীর রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, গমকে গমকে, তীব্র মধুর উন্মাদনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই সুরে আকৃষ্ট হইয়া বনের ভিতর হইতে, একটি বিষধর কালীয় নাগ ফণা দুলাইতে দুলাইতে বাহির হইয়া আসিল। দারুণ উত্তেজনায়, জহরের চোখের তারা দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ হাতের বাঁশিটা সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সেই কালীয় নাগের উদ্ধত ফণার সমুখে তাহার অকম্পিত করতল পাতিয়া ধরিল। মুহূর্তে একটি তীব্র দংশন! দেখিতে দেখিতে জহরের সর্বশরীর সেই সাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক সভয়ে, স্তম্ভিতবিস্ময়ে জহরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জহর কিন্তু নিষ্কম্প, নির্বিকার—উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। ধীরগম্ভীরকণ্ঠে, সে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে-ধীরে শীঘ্রই বিজয়ী বীরের মতো সগৌরবে বিষমুক্ত হইয়া উঠিল। বিমুগ্ধ, বিস্মিত জনতা, সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া, বিশুন ধীরে ধীরে নীরবে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই করিয়া আজ পর্যন্ত, জহর নিরানব্বই বার নিজের দেহে সর্পদংশন করাইয়া, অবলীলাক্রমে বিষমুক্ত হইয়াছে। এইবার শততম এবং শেষতম সর্পদংশন। এই সর্বশেষ সর্পের বিষ, মন্ত্রবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই, জহর কঠোর ব্রত উদযাপিত হইবে; সে সর্পমন্ত্রে সিদ্ধকাম হইবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়াই জহরের জীবনের পরমতম লক্ষ্য, একমাত্র মহাব্রত।

এই সাধনার জন্য সে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছে। আজীবন চিরকুমার থাকিয়া, নিষ্কামভাবে সংযতচিত্তে ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে।

জহরের অগণিত গুণমুগ্ধ শিষ্য, যখন উদগ্রীব হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় সহসা সেদিন রাত্রে, তাহার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল। পরিণামে এই ব্যাপারটি যে তাহার সাধনার ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যাইবে, তাহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

ভবঘুরের মতো জহর তখন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারীজাতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশ জহরের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধনার পথে সাংঘাতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ক্রমে নারীজাতির সম্বন্ধে অন্তরে সে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে শুরু করিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সে দেখিল, ক্ষীণস্রোতা একটি নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমাসুন্দরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদংশনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। স্রোতের জলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহুকালের প্রচলিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুড়ে জাতির স্বধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া, সে নদীর জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিতা করিল।

জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটিকে লইয়া সে কি করিবে? কে যে তাহার আত্মীয়, কে তাহার স্বজন—কিছুই সে বলিতে পারে না। বিষের প্রকোপে তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জহর বড় বিপদে পড়িল। বেচারী নিরীহ, নিরাশ্রয়া মেয়েটি, নিরুপায়ের মতো করুণ কাতর দৃষ্টি মেলিয়া জহরের দিকে তাকাইয়া থাকে। জহর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, কেমন যেন দয়া হয় মেয়েটির উপর। দারুণ ঘৃণা ধীরে ধীরে মধুর মমতায় রূপান্তরিত হইয়া আসে। সে-ই শেষে আশ্রয় দিয়া ফেলিল এই মেয়েটিকে—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে! জহর তাহার সংস্কারবশে, বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মানুষ করিবে। সে তাহাকে একরকম উগ্র ঔষধ পান করাইল, যাহাতে এই ঔষধের গুণে, তাহার মধ্যে নারী-সুলভ কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়।

জহর তাহার নাম রাখিল চন্দন—পুরুষের নাম। কিশোরবেশী চন্দনকে সঙ্গে লইয়া জহর এইবার অন্য এক সাপুড়ের দলে যোগদান করিল। সেই দলের বৃদ্ধ সর্দার, জহরের আশ্চর্য চরিত্রবল দেখিয়া এত বেশি মুগ্ধ হইল যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে জহরকে সে সেই দলের সর্দার করিয়া দিয়া গেল। ক্রমে জহর এই অর্ধসভ্য ভবঘুরে সাপুড়ের দলের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠিল।

চন্দন যে বালক নয়, দলের কেহই সে কথা জানে না। জহরের এক প্রিয়তম শিষ্য ঝুমরো, তাহার একমাত্র প্রিয় সহচর। চন্দনকে ঝুমরো বড় ভালবাসে।

এই ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী জহর, নিরানব্বইটি বিষধর সর্পদংশনের কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহার সাধনার প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তখন সহসা এক সচকিত মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিয়া সে অনুভব করিল যে, তাহার সংযম-সাধনার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে বোধকরি তাহার পদস্খলন হইতে বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে অকস্মাৎ এক তীব্র মধুর বেদনার মতো চন্দনের রমণীয় সুকুমার রূপ-মাধুরী, তাহার বুকের মধ্যে আসিয়া বিঁধিল এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উন্মাদ অস্থির করিয়া তুলিল। প্রাণপণ চিত্তসংযমের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাহার এই সাময়িক মোহকে অতিক্রম করিল। উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসার পদপ্রান্তে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিনিদ্র চক্ষে এই অপরিসীম আত্মগ্লানির জন্য অনুতাপে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দেবী প্রতিমার কাছে ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়া, সে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

কিন্তু যে সুপ্ত কামনার আগুন একবার জ্বলিয়াছে, এত সহজে কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে চাহিল না। ঠিক সেইদিনই খবর পাওয়া গেল, রাজার সিপাহীরা সাপুড়েদের উপর বিষম অত্যাচার শুরু করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি ভয়ানক ছেলেচুরি হইতেছে। সকলের ধারণা সাপুড়েরাই এই কার্য করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র, জহর সদলবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহু পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজন, ভীষণ, শ্বাপদসঙ্কুল এক অরণ্যের মাঝখানে তাহাদের তাঁবু ফেলিল। বন্য, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁবুর চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া অনেকেই তখন প্রচুর ফূর্ত্তি করিতেছে। এই বিরাট আমোদের মজলিস জমাইয়া তুলিয়াছে, দিল খোলার দল। তাহাদের নৃত্যগীতোৎসব তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জহর, ঝুমরো, চন্দন, বিশুন, বিশুনের পুত্র তেঁতুলে, নীল-চশমাধারী দলের যাদুকর গণকঠাকুর ঘন্টাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে, মুগ্ধ আনন্দে এই অপূর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে।

এমন সময় কি যেন একটা তুচ্ছ কারণে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সঙ্গে ঝুমরোর ভীষণ কলহ বাধিয়া গেল। কলহ প্রথমে মুখে-মুখেই চলিতেছিল, তাহারপর হইল হাতাহাতি, তাহারপর ক্রমে মারামারি। চন্দন ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। তেঁতুলে অকথ্য অপমান করিবে ঝুমরোকে—এ তাহার অসহ্য। সেও ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝখানে। কিন্তু টানাটানি ধ্বস্তাধ্বতিতে হঠাৎ যেই মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল, দলের সকলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দেখিল—চন্দন পুরুষ নয়—পুরুষের ছদ্মবেশে পরমাসুন্দরী এক তরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আর একটি সুন্দরী তরুণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম মৌটুশী। সে নিজের উত্তরীয়টি তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দনের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিশোর চন্দনকে, সে কুমারী-হৃদয়ের নীরব প্রেমের পূজাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিল—আজ যখন দেখিল, চন্দন তাহারই মত এক তরুণী, তখন তাহার লজ্জারুণ প্রণয় স্বপ্নের প্রাসাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল। যে গভীর উদার প্রেম তাহার

হৃদয়ে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মধুর সখিত্বে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। জহর আসিয়া, লজ্জাবনতমুখী চন্দনকে টানিয়া, একেবারে তাহার তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক একেবারে অবাক। কেহ স্বপ্নেও কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই—জহরের মত একজন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মন্ত্র-সাধক, এমন করিয়া এই সুন্দরী যুবতীটিকে যুবক সাজাইয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়াছে।

শুধু বিস্মিত হইল না একজন—সে ঘণ্টাবুড়ো। এই বেদিয়ার দলে সে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির রহস্যময় মায়াবীর রূপে বাস করে। অনবরত মদ্যপান করে, আর খড়ি পাতিয়া সকলের ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিন্তু সব কথা কখনো পরিষ্কার করিয়া বলে না।

এই ব্যাপারে ঘণ্টাবুড়ো, পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া, সহসা এক অদ্ভুত ক্রূর অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

এদিকে নিভৃতে, তাঁবুর এককোণে, থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জহর ভীতা হরিণীর মতো চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, 'চন্দন, চন্দন, তুই আমার—একমাত্র আমার!'

তাহার এতদিনকার রুদ্ধ আত্মসংযমের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—দুকূলপ্লাবী বন্যার মতো সেই উন্মত্ত আবেগ, সেই দুর্দমনীয় দুর্বার বাসনা তাহাকে যেন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দন বৃথাই নিজেকে প্রাণপণে তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যখন জহরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে তাহার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিবার জন্য মিনতি কাতরকণ্ঠে জহরকে স্মরণ করাইয়া দিল—তাহার মহাব্রতের কথা, তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, নাগ-মন্ত্র-সাধনার সিদ্ধিলাভের কথা।

কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নির্মম মহাসত্যের মতো ধক করিয়া বাজিল। সত্যই ত! এ কি করিতেছে সে! জহর যেন অকস্মাৎ তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মনসা-দেবীর প্রতিমার পানে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর কিসের যেন একটা অব্যক্ত মর্মযন্ত্রণায় কাতর হইয়া, তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আজই—এই রাত্রেই সে তাহার শততম সর্পদংশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জীবনের মহাব্রত উদযাপন করিবে। আর বিলম্ব নয়।

বিষধর একটি সর্পের সন্ধান করিয়া, জহর যেমনই তাহার কর্ম সিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনিই বিশুন কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল—চন্দনকে লইয়া ঝুমরো পলায়ন করিয়াছে। মৌটুশীর আগ্রহ এবং সাহায্যেই নাকি তাহারা এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।

জহরের ব্রত আর সাঙ্গ করা হইল না। যে কঠোর সংযমের বন্ধনে নিজেকে সে পুনর্বার পাথরের মতো স্তব্ধ নির্বিকার করিয়া তুলিয়াছিল, বিশুনের এই মর্মান্তিক সংবাদে প্রখর স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো সে সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল।

ক্রোধে, উন্মাদের মতো অধীর হইয়া, জহর ছুটিয়া চলিল চন্দন-ঝুমরোর সন্ধানে। কিন্তু দলের কেহই তাহাকে তাহাদের সন্ধান দিতে পারিল না, তীব্র উত্তেজনায় সর্বশরীরে তখন তাহার যেন আগুন ধরিয়া গেছে।

উন্মত্তের মতো তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া, সে ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল,—বিষধর কালীয়নাগ! সেই ভীষণ কালীয়নাগকে লইয়া, সে ছুটিয়া আসিল মহাকাল-মন্দিরে—তাহার পর সেই কালীয়নাগকে মন্ত্রপূত করিয়া ঝুমরোর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমরো ও চন্দন তখন গভীর আনন্দে প্রেমাঞ্চিত হইয়া, গান গাহিতে গাহিতে নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছে। দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়া, তাহারা দুজনে একটি মধুর সুখের নীড় রচনা করিয়া, পরমানন্দে প্রেম-মধুযামিনী যাপন করিবে অনন্তকাল ধরিয়া—মুদিত বিহ্বল-চক্ষুর সম্মুখে তখন তাহাদের এই সুখ-স্বপ্নের মোহন মেদুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অপূর্ব আনন্দে বিভোর হইয়া, যখন তাহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেছে, তখন সহসা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সেই মন্ত্রপূত কালীয়নাগ আসিয়া ঝুমরোকে দংশন করিয়া দিয়া, অদৃশ্য হইয়া গেল। বিষের বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ঝুমরো সেখানে বসিয়া পড়িল।

চন্দন একেবারে স্তম্ভিত নির্বাক! নিঃসহায়, নিরুপায়ের মতো সে দাঁড়াইয়া রহিল। ঝুমরোকে বাঁচাইতে হইলে, এখন তাহার আবার সেই জহরের কাছে গিয়া দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নাই।

অবিরল অশ্রুধারে, চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না—সে চলিয়াছে সেই পরিত্যক্ত তাঁবুর দিকে। কিন্তু কেমন করিয়া, কোন মুখে, সে আবার জহরের কাছে গিয়া দাঁড়াইবে?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তরের মতো বসিয়া আছে। অশ্রুমুখী চন্দন আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাছে। ম্লানমুখে, মৃদুকম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, ঝুমরো তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে জহরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও প্রস্তুত। জহর একটি কথাও বলিল না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে চলিল চন্দনের পিছু পিছু। নীরবে সে গিয়া দাঁড়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, জহরের কাছে। এখন সে জহরের। ঝুমরোকে সে উত্তেজিত করুণ, ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'তুই দূরে চলে যা ঝুমরো, আমার চোখের সুমুখে থাকিস নে—আমি তোর নই'।

যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, একান্ত আপন, জীবন-সর্বস্ব, তাহাকে সে চায় না। চন্দনের উদগত অশ্রু আর বাধা মানে না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া যায়, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে।

অদূরে দাঁড়াইয়া, জহর এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল। যে কালীয়নাগ মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিয়া ঝুমরোকে বিষমুক্ত করিয়াছে, সে তখনও তাহার হাতে।

জহর একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, একবার তাকাইল ঝুমরোর দিকে—একবার মনে-মনে কি যেন ভাবিল।

অকস্মাৎ সে নির্বিকার ভাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ঝুমরো চীৎকার করিয়া কহিল, 'ওস্তাদ কি করলি!'

চন্দন ও ঝুমরো দুজনেই ছুটিয়া জহরের কাছে গেল। জহর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠল, 'ঝুমরো শিগগির একে নিয়ে চলে যা আমার সুমুখ থেকে—আমি বিষ হজম করবো, এই আমার শেষ সাপ-তারপর আমি মন্ত্র পড়বো। মেয়েমানুষের সামনে মন্তর নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে নিয়ে যা—এ জঙ্গল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা।'

চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দূরে চলিয়া গেছে, কিন্তু নাগমন্ত্র আর সে উচ্চারণ করিল না। স্মিতহাস্যে আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, 'মন্তর, ও সাপের মন্তর আর নয়—এইবার আমার মন্তর—'শিব শম্ভু—শিব শম্ভু'!

কালীয়নাগের বিষে তাহার সর্বশরীর ক্রমশ নীল হইয়া আসিতে লাগিল, চোখ দুইটি স্তিমিত নিস্তেজ হইয়া গেল; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখের উপরে মনে হইল, কিসের যেন এক অপার্থিব আনন্দের ভাস্কর দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার বিক্ষুব্ধ আত্মার সমস্ত বিক্ষোভ যেন শান্ত হইয়া গিয়াছে, জীবনব্যাপী মর্মযন্ত্রণার যেন অবসান হইয়াছে।

সর্বশেষ সর্পের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-সাধনায় পরিণামে সে সিদ্ধকাম হইল কি?

সংগীতাংশ

এক

হলুদ-গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল,
এনে দে, এনে দে, নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল,
কুসমী রঙ শাড়ি চুড়ি বেলোয়াড়ি
কিনে দে হাট থেকে,
এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল।
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল॥
তূরকুট পাহাড়ে, শাল-বনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকেল বেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
বেদে-বেদেনী নূপুর বেঁধে পায়।
যেতে দে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে পরাণ বাউল॥
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল॥

—কোরাস

দুই

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই,
ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো,
উধাও হয়ে বই॥

চিতা বাঘ মিতা আমার,
গোখরো খেলার সাথী,
সাপের ঝাঁপি বুকে ধরে
সুখে কাটাই রাতি।
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়নি ধরে গো আমি নাচি তাথৈ থৈ॥
নাচি তাথৈ থৈ॥

—কানন

তিন

কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো,
শ্বশুর সওদাগর,
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা লখিন্দর॥

ওলো কুল-বালা নে এই পলার মালা,
বর তোর ভেড়া হয়ে রইবে মালার ভয়ে
ও বৌ, পাবি নে জীবনে সতীন জ্বালা॥

আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী।
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ ;
ঔষধ জানিলো, হোঁৎকা স্বামীর,
কোঁৎকা খায় যে কামিনী॥

পেত্নী পাওয়া মিনসে গো,
ভূতে-ধরা বৌ গো।

কালিয়া পেরেত মামদো ভূত
শাক-চুন্নি হামদো পুত
পালিয়ে যাবে, বেদের কবচ লও গো॥

বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও গো বৌ, হবে খোকা-খুকি॥
নাচ, নাচ, নাচ-বেদের নাচ ? সাপের নাচ ?
সোলেমানি পাথর নেবে ? রঙিন কাঁচ ?

—কোরাস

চার

দেখি লো তোর হাত দেখি।
হাতে হলুদ-গন্ধ, এলি রাঁধতে রাঁধতে কি ?
মনের মতন বর পেলে, নয় কন্যা ছয় ছেলে।

চিকন আঙ্গুল দীঘল হাত, দালান-বাড়ি ঘরে ভাত,
হাতে কাঁকন পায়ে বেঁকি।

ও বাবা! এ কোন ছুঁড়ি? সাত ননদ তিন শ্বাশুড়ি।
ডুবে ডুবে খাচ্ছ জল, কার সাথে তোর পিরীত বল।

চোখের জলে পারবি তারে বাঁধতে কি?
দেখি লো তোর হাত দেখি।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

পাঁচ

(কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ,
তোর সাথে তার আড়ি-আড়ি-আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ি॥

বৌ কসনে কথা কসনে,
এত অল্পে অধীর হসনে,
ও নতুন ফুলের খবর পেলে
পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
ওর মন্দ স্বভাব ভারি॥

—কানন

ছয়

মৌটুশী— পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
হিজল-ফুলের মালা।
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকণ-কালা॥
চন্দন— নই আমি সে বনের কিশোর,
(তোর) ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর,
বন জানে আর মন জানে লো, আমার বুকের জ্বালা॥

ঝুমরো— ঘি-মউ-মউ আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানি আন্,
বনের মেয়ে বন-দেবতায় করবে মালা দান।
লতা-পাতার বাসর-ঘরে
রাখ ওরে ভাই বন্ধ করে,
ভুলিসনে ওর চাতুরীতে, ওলো বনবালা॥

—মেনকা, কানন, পাহাড়ী।

সাত

ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসে রে
ফুল-ফুটানো হাসি।
হিয়ার কাছে পিয়ার ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে
তোমার নিয়া পিয়া আমি
হইব উদাসী॥

—পাহাড়ী ও কানন